মেজদিদি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

: প্রাপ্তিস্থান :
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
৫ই মাঘ—১৩৭০

মুদ্রাকর :
শ্রীমথুর মোহন গাঁতাইত
কামিনী প্রিণ্টার্স
১২, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০০৬

মেজদিদি

॥ এক ॥

কেষ্টর মা মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া-চিন্তিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চৌদ্দ বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বৈমাত্রিয় বড় বোন কাদম্বিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, যা কেষ্ট, তোর দিদির বাড়িতে গিয়ে থাক্ গে। সে বড়মানুষ, বেশ থাকবি যা।

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাঁদিয়া-কাটিয়া জ্বর করিয়া ফেলিল। শেষে ভাল হইয়া ভিক্ষা করিয়া শ্রাদ্ধ করিল। তার পরে ন্যাড়া মাথায় একটি ছোট পুঁটলি সম্বল করিয়া দিদির বাড়ি রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাহাকে চিনিত না। পরিচয় পাইয়া এবং আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। সে নিজের নিয়মে ছেলেপুলে লইয়া ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছিল—অকস্মাৎ এ কি উৎপাত!

পাড়ার যে বুড়োমানুষটি কেষ্টকে পথ চিনাইয়া সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাকে কাদম্বিনী খুব কড়া-কড়া দু-চার কথা শুনাইয়া দিয়া কহিল, ভারী আমার মাসীমার কুটমকে ডেকে এনেছেন, ভাত মারতে! সৎমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বজ্জাত মাগী জ্যান্তে একদিন খোঁজ নিলে না, এখন মরে গিয়ে ছেলে পাঠিয়ে তত্ত্ব করেচেন। যাও বাপু, তুমি পরের ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—এসব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারব না।

বুড়ো জাতিতে নাপিত। কেষ্টর মাকে ভক্তি করিত, মা ঠাকরুণ বলিয়া ডাকিত। তাই এত কটূক্তিতেও হাল ছাড়িল না। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, দিদি-ঠাকরুণ, লক্ষ্মীর ভাঁড়ার তোমার। কত দাস-দাসী, অতিথি-ফকির, কুকুর-বেড়াল এ-সংসারে পাত পেতে মানুষ হয়ে যাচ্ছে, এ-ছোঁড়া দু'মুঠো খেয়ে বাইরে পড়ে থাকলে তুমি জানতেও পারবে না। বড় শান্ত সুবোধ ছেলে দিদি-ঠাকরুণ! ভাই

বলে না নাও, দুঃখী অনাথ বামুনের ছেলে বলেও বাড়ির কোণে একটু ঠাঁই দাও দিদি।

এ স্তুতিতে পুলিশের দারোগার মন ভেজে, কাদম্বিনী মেয়েমানুষ মাত্র। কাজেই সে তখনকার মত চুপ করিয়া রহিল। বুড়া কেষ্টকে আড়ালে ডাকিয়া দুটা শলা-পরামর্শ দিয়া চোখ মুছিয়া বিদায় লইল।

কেষ্ট আশ্রয় পাইল।

কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুজ্যের ধান-চালের আড়ত ছিল। তিনি বেলা বারোটার পর বাড়ি ফিরিয়া কেষ্টকে বক্র কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, এটি কে?

কাদম্বিনী মুখ ভারী করিয়া জবাব দিল, তোমার বড়কুটুম গো, বড়কুটুম। নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর—পরলোকের কাজ হোক।

নবীন, সৎ-শাশুড়ীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন, ব্যাপারটা বুঝিলেন, কহিলেন, বটে! বেশ নধর গোলগাল দেহটি ত!

স্ত্রী কহিলেন, বেশ হবে না কেন? বাপ আমার বিষয়-আশয় যা-কিছু রেখে গিয়েছিলেন, সে সমস্তই মাগী ওর গব্‌ভরে ঢুকিয়েচে। আমি তো তার একটি কানা-কড়িও পেলুম না।

বলা বাহুল্য, এই বিষয়-আশয় একখানি মাটির ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি বাতাবি-নেবুর গাছ। ঘরটিতে বিধবা মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন এবং নেবুগুলি বিক্রি করিয়া ছেলের ইস্কুলের মাহিনা যোগাইতেন।

নবীন রোষ চাপিয়া বলিলেন, খুব ভাল।

কাদম্বিনী কহিলেন, ভাল নয় আবার! বড়কুটুম যে গো! তাঁকে তার মত রাখতে হবে ত! এতে আমার পাঁচুগোপালের বরাতে একবেলা এক-সন্ধ্যা জোটে ত তাই ঢের! নইলে অখ্যাতিতে দেশ ভরে যাবে। বলিয়া পাশের বাড়ির দোতলা ঘরের বিশেষ একটা খোলা জানালার প্রতি রোষকষায়িত লোচনের অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘরটা তার মেজ-জা হেমাঙ্গিনীর।

কেষ্ট বারান্দার একধারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া লজ্জায় মরিয়া

যাইতেছিল। কাদম্বিনী ভাঁড়ারে ঢুকিয়া একটা নারিকেল মালায় একটুখানি তেল আনিয়া, তাহার পাশে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না, যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এস গে—বলি, ফুলেল তেল-টেল মাখা অভ্যাস নেই ত? স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, তুমি চান করতে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়ো গো, নইলে ডুবে মলে-টলে বাড়িসুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়বে।

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল। সে স্বভাবতঃই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এত-খানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—বেলাও হইয়াছে। নানা কারণে পাতের ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন অদূরে খাইতে বসিয়াছিলেন; লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, কেষ্টকে আর দুটি ভাত দাও গো—

দিই, বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একথালা ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া, উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই হয়েচে! এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে। ওবেলা দোকান থেকে মণ-দুই মোটা চাল পাঠিয়ে দিয়ো, নইলে দেউলে হতে দেরি হবে না, তা বলে রাখছি।

মর্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টর মুখখানি আরও নুঁকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। দুঃখিনী জননীর কাছে সরু চাল খাইতে পাইয়া-ছিল কিনা, সে খবর জানি না, কিন্তু পেট ভরিয়া খাওয়ার অপরাধে কোনদিন যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয় নাই, তাহা জানি। তাহার মনে পড়িল, হাজার বেশী খাইয়াও কখনও মায়ের মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, এই সেদিনও ঘুড়ি-লাটাই কিনিবার জন্য দু'মুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ভাতের

থালার উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুঁজিয়া গিলিতে লাগিল। বাঁ-হাতটা তুলিয়া চোখ মুছিতে পর্যন্ত সাহস করিল না, পাছে দিদির চোখে পড়ে। অনতিপূর্বেই মায়া-কান্না কাঁদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এতবড় মাতৃ-শোকেরও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।

॥ দুই ॥

পৈতৃক বাড়িটা দুই ভায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

পাশের দোতলা বাড়িটা মেজভাই বিপিনের। ছোটভায়ের অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিনেরও ধান-চালের কারবার। তাঁহার অবস্থা ভাল, কিন্তু বড়ভাই নবীনের সমান নয়। তথাপি ইহার বাড়িটাই দোতলা। মেজবৌ হেমাঙ্গিনী শহরের মেয়ে। তিনি দাস-দাসী রাখিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া, জাঁকজমকে থাকিতে ভালবাসেন। পয়সা বাঁচাইয়া গরিবী চালে চলে না বলিয়াই বছর-চারেক পূর্বে দুই জায়ে কলহ করিয়া পৃথক হইয়াছিলেন। সেই অবধি প্রকাশ্যে কলহ অনেকবার হইয়াছে, অনেকবার মিটিয়াছে, কিন্তু মনোমালিন্য একদিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ, সেটা বড়-জা কাদম্বিনীর একলার হাতে। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝিতেন, ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না। কিন্তু মেজবৌ অত পাকা নয়, অমন করিয়া বুঝিতেও পারিতেন না। ঝগড়াটা প্রথমে তিনিই করিয়া ফেলিতেন বটে, কিন্তু তিনিই মিটাই-বার জন্য, কথা কহিবার জন্য, খাওয়াইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ছট্-ফট্ করিয়া একদিন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া বসিতেন। শেষে, হাতে-পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া-কাঁটিয়া, ঘাট মানিয়া, বড়-জাকে নিজের ঘরে ধরিয়া আনিয়া ভাব করিতেন। এমনই করিয়া দুই জায়ের অনেকদিন কাটিয়াছে। আজ বেলা তিনটা সাড়ে-তিনটার সময় হেমাঙ্গিনী এবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুপের পার্শ্বে সিমেণ্ট-বাঁধান বেদীর উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল, কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও

অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিতে-ছিলেন। মেজ-জাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন, মাগো, ছোঁড়াটা কি নোংরা কাপড়-চোপড় নিয়েই এসেচে!

কথাটা সত্য। কেষ্টর সেই লাল-পেড়ে ধুতিটা পড়িয়া এবং চাদরটা গায়ে দিয়া কেহ কুটুমবাড়ি যায় না। দুটোকে পরিষ্কার করার আবশ্যকতা ছিল বটে, কিন্তু রজকের অভাবে ঢের বেশী আবশ্যক হইয়াছিল পুত্র পাঁচুগোপালের জোড়া-দুই এবং পিতার জোড়া-দুই পরিষ্কার করিবার। কেষ্ট আপাততঃ তাহাই করিতেছিল। হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই টের পাইলেন বস্ত্রগুলি কাহাদের। কিন্তু সে উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেটি কে দিদি? ইতিপূর্বে নিজের ঘরে বসিয়া আড়ি পাতিয়া তিনি সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন। দিদি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, দিব্যি ছেলেটি ত! মুখের ভাব তোমার মতই দিদি। বলি বাপের বাড়ির কেউ না কি?

কাদম্বিনী বিরক্ত-মুখে জবাব দিলেন, হুঁ, আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে, ও কেষ্ট, তোর মেজদিদিকে একটা প্রণাম কর্ না রে! কি অসভ্য ছেলে বাবা! গুরুজনকে একটা নমস্কার করতে হয়, তাও কি তোর মা মাগী শিখিয়ে দিয়ে মরেনি রে?

কেষ্ট থতমত খাইয়া উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ের কাছেই নমস্কার করাতে তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন, আ মর, হাবা কালা নাকি! কাকে প্রণাম করতে বললুম, কাকে এসে করলে!

বস্তুতঃ আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রাম আঘাতে তাহার মাথা বে-ঠিক হইয়া গিয়াছিল। কথার ঝাঁজে ব্যস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া শির অবনত করিতেই তিনি হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, থাক থাক, হয়েচে ভাই—চিরজীবি হও। কেষ্ট মূঢ়ের মত তাঁহার মুখের পানে চাইয়া রহিল। এ-দেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না।

তাহার সেই কুণ্ঠিত ভীত অসহায় মুখখানির পানে চাহিবামাত্র

হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া, সহসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পরিশ্রান্ত ঘর্মাপ্লুত মুখখানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া, জা'কে কহিলেন, আহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাকনি কেন?

কাদম্বিনী হঠাৎ অবাক্ হইয়া গিয়া জবাব দিতে পারিলেন না; কিন্তু নিমেষে সামলাইয়া লইয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমি ত তোমার মত বড়মানুষ নই মেজবৌ, যে বাড়িতে দশ-বিশটা দাস-দাসী আছে? আমাদের গেরস্ত-ঘরে—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, উমা, শিবুকে একবার এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দে ত মা, বট্‌ঠাকুর আর পাঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেচে এনে শুকোতে দিক। বড়-জা'য়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এ-বেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল আমার ওখানে খাবে দিদি। সে ইস্কুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিয়ো; আমি ততক্ষণ একে নিয়ে যাই। কেষ্টকে কহিল, ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট—এসো আমার সঙ্গে। বলিয়া তাহার একটি হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

কাদম্বিনী বাধা দিলেন না। অধিকন্তু হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় খোঁচাটাও নিঃশব্দে হজম করিলেন। তাহার কারণ, যে ব্যক্তি খোঁচা দিয়াছে, সে এ-বেলা খরচটাও বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছু ছিল না। তাই, গাভী দুধ দিতে দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

॥ তিন ॥

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, কি খেয়ে এলি কেষ্ট?

কেষ্ট সলজ্জ নতমুখে কহিল, লুচি।

কি দিয়ে খেলি?

কেষ্ট তেমনিভাবে বলিল, রুইমাছের মুড়োর তরকারি, সন্দেশ, রসগো—

ইস্! বলি মেজ-ঠাকরুণ মুড়োটা কার পাতে দিলেন?

হঠাৎ এই প্রশ্নে কেষ্টর মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ জানোয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেষ্টর বুকের ভিতরটায় তেমনিধারা করিতে লাগিল। দেরি দেখিয়া কাদম্বিনী কহিলেন, তোর পাতে বুঝি।

গুরুতর অপরাধীর মত কেষ্ট মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বলি, শুনলে ত?

নবীন সংক্ষেপে হু বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, খুড়ী আপনার লোক, তার ব্যবহারটা দেখ! পাঁচুগোপাল আমার রুইমাছের মুড়ো বলতে অজ্ঞান, সে কি তা জানে না? তবে কোন্ আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে দিলে? বলি হাঁ রে কেষ্ট সন্দেশ-রসগোল্লা খুব পেট-ভরে খেলি? সাতজন্মে কখনও তুই এ-সব চোখেও দেখিসনি। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যারা দুটি ভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে লুচি-সন্দেশ কি হবে! কিন্তু আমি বলচি তোমাকে, কেষ্টকে মেজগিন্নী বিগড়ে না দেয় তো আমাকে কুকুর বলে ডেকো।

নবীন মৌন হইয়া রহিলেন। কারণ স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবৌ তাহাকে বিগড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার স্ত্রীর কিন্তু স্বামীর উপরে বিশ্বাস ছিল না, বরং ষোল-আনা ভয় ছিল, সাধাসিধা ভালোমানুষ বলিয়া যে-কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে। সেইজন্য ছোটভাই কেষ্টর মানসিক উন্নতি-অবনতির প্রতি সেই অবধি তিনি প্রখর দৃষ্টি পাতিয়া রাখিলেন।

পরদিন হইতেই দুটো চাকরের একটাকে ছাড়ান হইল, কেষ্ট নবীনের ধান-চালের আড়তে কাজ করিতে লাগিল। সেখানে সে ওজন করে, বিক্রি করে, চার-পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ

করিয়া আনে, দুপুরবেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে দোকান আগলায়। দিন-দুই পরে একদিন তিনি আহার-নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া গেলে সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেষ্ট পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতেছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায় বোধ করি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে, এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপটি করিয়া দিদির ঘুমভাঙার আশায় বসিয়াছিল, হঠাৎ ডাক শুনিল, কেষ্ট?

সে আহ্বান কি স্নিগ্ধ হইয়াই তাহার কানে বাজিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, মেজদি তাঁহার দোতলার ঘরের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেষ্ট একটিবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া, সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'দিন দেখিনি ত? এখানে চুপ করিয়া বসে কেন কেষ্ট?

একে ত ক্ষুধায় অল্পেই চোখে জল আসে, তাহাতে এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর! তাহার দু'চোখ টল্‌টল্ করিতে লাগিল। সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

মেজখুড়ীমাকে সব ছেলেমেয়েরা ভালবাসিত। তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া কাদম্বিনীর ছোটমেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চেঁচাইয়া বলিল, কেষ্টমামা, রান্নাঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে, খাও গে, মা খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছে।

হেমাঙ্গিনী অবাক্ হইয়া কহিলেন, কেষ্টর এখনও খাওয়া হয়নি, তোর মা খেয়ে ঘুমোচ্চে কি রে—হাঁ কেষ্ট আজ এত বেলা হল কেন?

কেষ্ট ঘাড় হেঁট করিয়াই রহিল। টুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, কেষ্টমামার রোজ ত এমনি বেলাই হয়। বাবা খেয়ে-দেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবে ত ও খেতে আসে।

হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন তাহাকে দোকানের কাজে লাগান হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়ান হইবে, এ আসা অবশ্য তিনি করেন নাই;

কিন্তু একবার এই বেলার দিকে চাহিয়া, একবার এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আর্ত শিশুদেহের পানে চাহিয়া, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ি চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুই পরে একবাটি দুধ হাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কেষ্ট খাইতে বসিয়াছিল। একটা পিতলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুকনা ড্যালাপাকান ভাত। একপাশে একটুখানি ডাল ও কি একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেষ্ট খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে একটিবার মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, পাতে গোনা একটিও ভাত পড়িয়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অন্ন নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাঁহার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে চাপিতে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

॥ চার ॥

সর্দি উপলক্ষ্য করিয়া হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন-দুই থাকিয়া আপনি ভাল হইয়া যাইত। দিন-কয়েক পরে এমনি একটু জ্বর বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। ঘরে কেহ ছিল না, হঠাৎ মনে হইল কে যেন অতি সন্তর্পণে কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ডাকিলেন, কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে, ললিত?

কেহ সাড়া দিল না। আবার ডাকিতে, আড়াল হইতে জবাব আসিল, আমি।

কে আমি রে? আয়, ঘরে এসে বোস।

কেষ্ট সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন রে কেষ্ট?

কেষ্ট আরও একটু সরিয়া আসিয়া, মলিন কোঁচার খুঁট খুলিয়া দুটি আধ-পাকা পেয়ারা বাহির করিয়া বলিল, জ্বরের উপর খেতে বেশ।

হেমাঙ্গিনী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, কোথায় পেলি রে? আমি কাল থেকে লোকের কত খোশামোদ করছি, কেউ এনে দিতে পারেনি, বলিয়া পেয়ারাসুদ্ধ কেষ্টর হাতখানি ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কেষ্ট লজ্জায় আহ্লাদে আরক্ত মুখ হেঁট করিল। যদিও এটা পেয়ারার সময় নয়, হেমাঙ্গিনীও খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি এই দুটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে দুপুরবেলার সমস্ত রোদটা কেষ্টর মাথার উপর দিয়া বাহিয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ কেষ্ট, কে তোকে বললে আমার জ্বর হয়েচে।

কেষ্ট জবাব দিল না।

কে বললে রে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েচি?

কেষ্ট তাহারও জবাব দিল না। সে সেই যে মুখ হেঁট করিল, আর তুলিতেই পারিল না। ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরু-স্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, আদর করিয়া 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আর কত কি কৌশলে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন। বিস্তর অনুসন্ধানে পেয়ারা সংগ্রহ করিবার কথা হইতে শুরু করিয়া, তাহার দেশের কথা, মায়ের কথা, খাওয়া-দাওয়ার কথা, এখানে দোকানে কি কি কাজ করিতে হয় তাহার কথা, একে একে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, এই তোর মেজদিকে কখনও কিছু লুকোস নে কেষ্ট, যখন দরকার হবে চুপি চুপি এসে চেয়ে নিস্—নিবি ত?

কেষ্ট আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

সত্যকার স্নেহ যে কি, তাহা দুঃখী মায়ের কাছে কেষ্ট শিখিয়াছিল, এই মেজদির মধ্যে তাহাই আস্বাদন করিয়া কেষ্টর রুদ্ধ মাতৃশোক আজ গলিয়া ঝরিয়া গেল। উঠিবার সময় মেজদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু, তাহার দিদির আক্রোশ তাহার প্রতি প্রতিদিনই বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কারণ সে সৎমার ছেলে, সে নিরুপায়। অখ্যাতির ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না! সুতরাং যখন রাখিতে হইবে তখন যতদিন তাহার দেহ বহে, ততদিন কষিয়া খাটাইয়া লওয়াই ঠিক।

সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন—সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথায় ছিলি রে কেষ্ট?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, বল্ শীগ্‌গির।

কেষ্ট তথাপি মৌন হইয়া রহিল। মৌন থাকিলে যাহাদের রাগ পড়ে, কাদম্বিনী সে দলের নহেন। অতএব কথা বলাইবার জন্য তিনি যতই জেদ করিতে লাগিলেন, বলাইতে না পারিয়া তাঁহার ক্রোধ এবং রোখ ততই চড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাঁচুগোপালকে ডাকিয়া তাহার দুই কান পুনঃ পুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাত্রে হাঁড়িতে চাল লইলেন না।

আঘাত যতই গুরুতর হোক, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগে না। পর্বতশিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত-পা ভাঙে না, ভাঙে শুধু তখনই—যখন পদতলস্পৃষ্ট কঠিনভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেষ্টর। মায়ের মরণ যখন পায়ের নীচের নির্ভরস্থলটুকু তাহার একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল, তখন হইতে বাহিরের কোন আঘাতই তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত না। সে দুঃখীর ছেলে, কিন্তু কখনও দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত তাহার পূর্বপরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদম্বিনীর দেওয়া কঠোর দুঃখকষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য

করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিল না বলিয়াই। কিন্তু আজ পারিল না, আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাতৃস্নেহের সুকঠিন ভিত্তির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই আজিকার এই অত্যাচার অপমান তাহাকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া দিল। মাতাপুত্র এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া, অপমান করিয়া, দণ্ড দিয়া, চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূমিশয্যায় পড়িয়া আজ অনেক দিনের পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া, মেজদির নাম করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন সকালে কেষ্ট হঠাৎ গুটিগুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে বিছানার একপাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী পা দুইটি একটু গুটাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, দোকানে যাস্‌নি কেষ্ট?

এইবার যাব।

দেরি করিস নে দাদা, এইবেলা যা, নইলে এক্ষুনি আবার গালা-গালি করবে। কেষ্টর মুখ একবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর হইল। যাই, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া আবার চুপ করিল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, কিছু বলবি আমাকে রে?

কেষ্ট মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, কাল কিছু খাইনি মেজদি—

কাল থেকে খাস্‌নি! বলিস্ কি কেষ্ট? কিছুক্ষণ পর্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আর একবার কাছে বসাইয়া, একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন, কাল রাত্তিরেই কেন এলি নে?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন,

আমার মাথার দিব্যি রইল ভাই, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা ব'লে মনে করবি।

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদম্বিনীর কানে গেল। তিনি নিজের বাড়ি হইতে মেজবৌকে ডাক দিয়া বলিলেন, ভাইকে আমি খাওয়াতে পারি নে যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে পড়ে বলতে গেছ?

কথার ধরণ দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর গা জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, যদি গায়ে পড়েই ব'লে থাকি, তাতেই বা দোষ কি?

কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, তোমার ছেলেটিকে ডেকে এনে আমি যদি এমনি করে বলি, তোমার মানটি থাকে কোথায় শুনি? তুমি এমন করে 'নাই' দিলে আমি তাকে শাসন করি কি করে বল দেখি?

হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, দিদি, পনের-ষোল বছর এক সঙ্গে ঘর করচি—তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তার পরে পরের ছেলেকে করো, তখন গায়ে পড়ে কথা কইতে যাবো না।

কাদম্বিনী অবাক হইয়া বলিলেন, আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা? দেবতার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা? এর পরে আরও কি যে তুমি বলে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবৌ।

মেজবৌ উত্তর দিলেন, কে দেবতা কে বাঁদর, সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বলব, না দিদি, যদি বলি ত এই যে—তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই। বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্থাৎ কর্তারা ঘরে ফিরিবার সময়টিতে বড়বৌ নিজের উঠানে দাঁড়াইয়া দাসীকে উপলক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জন-গর্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন—যিনি রাত-দিন কচ্ছেন, তিনিই এর বিহিত করবেন। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী! আমার ভায়ের মর্ম আমি বুঝি নে, বোঝে পরে! কখ্খনো ভাল হবে না—

ভাই-বোনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে ধর্ম সইবেন না —তা বলে দিচ্ছি, বলিয়া তিনি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উভয় জায়ের মধ্যে এই ধরনের গালি-গালাজ, শাপ-শাপান্ত অনেকবার অনেক রকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ ঝাঁজটা কিছু বেশী। অনেক সময় হেমাঙ্গিনী শুনিয়াও শুনিতেন না, বুঝিয়াও গায়ে মাখিতেন না; কিন্তু আজ নাকি তাঁহার দেহটা খারাপ ছিল, তাই উঠিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, এর মধ্যেই চুপ করলে কেন দিদি? ভগবান হয়ত শুনতে পাননি—আর খানিকক্ষণ ধরে আমার সর্বনাশ কামনা কর—বট্‌ঠাকুর ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন—এরই মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন?

কাদম্বিনী উঠানের উপরে ছুটিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আমি কি কোন সর্বনাশীর নাম মুখে এনেছি?

হেমাঙ্গিনী স্থিরভাবে জবাব দিলেন, মুখে আনবে কেন দিদি, মুখে আনবার পাত্রী নও। কি তুমি কি ঠাওরাও, একা তুমিই সেয়ানা আর পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাকা? ঠেস দিয়ে কার কপাল ভাঙচ, সে কি কেউ টের পায় না?

কাদম্বিনী এবার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন, টের পেলেই বা। যে দোষে থাকবে, তারই গায়ে লাগবে। আর একা তুমিই টের পাও, আমি পাই নে? কেষ্ট যখন এলো, সাত চড়ে রা করত না, যা বলতুম, মুখ বুজে তাই করত—আজ দুপুরবেলা কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করে ছাখো এই প্রসন্নর মাকে,—বলিয়া দাসীকে দেখাইয়া দিল।

প্রসন্নর মা কহিল, সে-কথা সত্য মেজবৌমা। আজ সে ভাত ফেলে উঠে যেতে মা বললেন, এ পিণ্ডিই না গিললে যখন যমের বাড়ি যেতে হবে, তখন এত তেজ কিসের জন্যে? সে বলে গেল,—আমার মেজদি থাকতে কাউকে ভয় করি নে।

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, কেমন হ'ল ত। কার জোরে এত তেজ

শুনি ? আজ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্চি, মেজবৌ, ওকে তুমি একশ'বার ডেকো না। আমাদের ভাইবোনের কথার মধ্যে থেকো না।

হেমাঙ্গিনী কথা কহিলেন না। কেঁচো সাপের মত চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কত বেশী পীড়নের দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতে পারিয়াছে।

আবার মাথা ধরিয়া জ্বর বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায় আসিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া ইহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ ? কারু মানা শুনবে না, যেখানে যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আছে, দেখলেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, রোজ রোজ আমার এত হাঙ্গামা সহ্য হয় না মেজবৌ। আজ বৌঠান আমাকে না-হক্ দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, বৌঠান হক্ কথা কবে বলেন যে আজ তোমাকে না-হক্ কথা বলেছেন ?

বিপিন বললেন, কিন্তু আজ তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবার বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভাপ্পের অমন বাগানখানা তোমার জন্যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্টে পুলিশ থামাতে এক শ' দেড় শ' ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝ না ? কবে এ স্বভাব যাবে ?

হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। আমি মা,—আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাই নে। আমার অসুখ করেচে —আর আমাকে বকিও না—তুমি যাও। বলিয়া গায়ের র‍্যাপার-খানা টানিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে

মনে স্ত্রী-র উপর এবং বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ দুর্ভাগাটার উপর আজ মর্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

॥ ছয় ॥

পরদিন সকালে জানালা খুলিতেই হেমাঙ্গিনীর কানে বড়-জায়ের তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের ঝঙ্কার প্রবেশ করিল। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ছোঁড়াটা কাল থেকে পালিয়ে রইল, একবার খোঁজ নিলে না?

স্বামী জবাব দিলেন, চুলোয় যাক। কি হবে খোঁজ করে?

স্ত্রী কণ্ঠস্বর সমস্ত পাড়ার শ্রুতিগোচর করিয়া বলিলেন, তা হলে যে নিজেদের গ্রামে বাস করা দায় হবে! আমাদের শত্রু তো দেশে কম নেই, কোথাও প'ড়ে মরে-টরে থাকলে ছেলেবুড়ো বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জেলখানায় যেতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

হেমাঙ্গিনী সমস্তই বুঝিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া খান-কতক রুটি খাইতেছিলেন, হঠাৎ চোরের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক।

কোথায় পালিয়েছিলি রে কেষ্ট?

পালাইনি ত। কাল সন্ধ্যার পর দোকানে শুয়েছিলুম, ঘুম ভেঙে দেখি, দুপুর রাত্তির। ক্ষিদে পেয়েছে মেজদি।

ও-বাড়িতে গিয়ে খেগে যা। বলিয়া হেমাঙ্গিনী নিজের রুটির থালায় মনোযোগ করিলেন।

মিনিট-খানেক চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেষ্ট চলিয়া যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কাছে বসাইলেন, এবং সেইখানেই ঠাঁই করিয়া রাঁধুনীকে ভাত দিতে বলিলেন।

তাহার খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছিল, এমন সময় উমা বহির্বাটী হইতে ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানাইল—

বাবা আসছেন যে!

মেয়ের ভাব দেখিয়া মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তাতে তুই অমন করছিস কেন?

উমা কেষ্টর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রত্যুত্তরে তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইয়া চোখ-মুখ নাড়িয়া তেমনি ইসারায় প্রকাশ করিল—খাচ্ছে যে!

কেষ্ট কৌতূহলী হইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছিল। উমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, শঙ্কিত মুখের ইশারা তাহার চোখে পড়িল। এক মুহূর্ত্তে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। কি ত্রাস যে তাহার মনে জন্মিল সেই জানে। মেজদি, বাবু আসচেন, বলিয়াই সে ভাত ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া রান্না-ঘরের দোরের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি উমাও আর একদিকে পলাইয়া গেল। অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল যেরূপ ব্যবহার করে, ইহারাও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া বসিল।

প্রথমটা হেমাঙ্গিনী হতবুদ্ধির মত একবার এদিক একবার ওদিক চাহিলেন, তার পরে পরিশ্রান্তের মত দেয়ালে ঠেস্ দিয়া এলাইয়া পড়িলেন। লজ্জা ও অপমানের শূল যেন তাঁহার বুকখানা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই স্ত্রীকে ওভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন-মুখে প্রশ্ন করিলেন, ও কি, খাবার নিয়ে অমন করে বসে যে?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন না। বিপিন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, আবার জ্বর হল নাকি? অভুক্ত ভাতের থালাটার পানে চোখ পড়ায় বলিলেন, এখানে এত ভাত ফেলে উঠে গেল কে? বলিত বুঝি?

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, না, সে নয়—ও-বাড়ির কেষ্ট যাচ্ছিল, তোমার ভয়ে আড়ালে লুকিয়েচে।

কেন?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেন, তা তুমিই ভাল জান। আর শুধু সে

নয়, তুমি আসছ খবর দিয়েই উমাও ছুটে পালিয়েচে।

বিপিন মনে মনে বুঝিলেন, স্ত্রীর কথাবার্তা বাঁকা পথ ধরিয়াছে। তাই বোধ করি সোজা পথে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে সহাস্যে বলিলেন, ও বেটি পালাতে গেল কি দুঃখে?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কি জানি? বোধ করি মায়ের অপমান চোখে দেখবার ভয়েই পালিয়েচে। পরক্ষণে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেষ্ট পরের ছেলে সে ত লুকোবেই। পেটের মেয়েটা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলে না যে, তার মায়ের কাউকে ডেকে একমুটো ভাত দেবার অধিকারটুকুও আছে।

এবার বিপিন টের পাইলেন, ব্যাপারটা সত্যিই বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পাছে একেবারে বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায় এজন্য অভিযোগটিকে সামান্য পরিহাসে পরিণত করিয়া চোখ টিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না,—তোমার কোন অধিকার নেই। ভিখিরী এলে ভিক্ষেও না। সে যাক—কাল থেকে আর মাথা ধরেনি ত? আমি মনে করেছি, সহর থেকে কেদার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই—না হয় একবার কলকাতায়—

অসুখ ও চিকিৎসার পরামর্শটা ঐখানেই থামিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, উমার সামনে তুমি কেষ্টকে কিছু বলেছিলে।

বিপিন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—আমি? কই না! ও হাঁ—সেদিন যেন মনে হচ্ছে বলেছিলুম—বৌঠান। রাগ করেন—দাদা বিরক্ত হন—উমা বোধ করি সেখানে দাঁড়িয়েছিল—কি জান—

জানি, বলিয়া হেমাঙ্গিনী কথাটা চাপা দিয়া দিলেন। বিপিন ঘরে ঢুকিতেই তিনি কেষ্টকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন, কেষ্ট, এই চারটে পয়সা নিয়ে দোকান থেকে কিছু মুড়িটুড়ি কিনে খেগে যা। ক্ষিদে পেলে আর আসিস্ নে আমার কাছে। তোর মেজদির এমন জোর নেই যে, সে বাইরের মানুষকে একমুঠো ভাত খেতে দেয়।

কেষ্ট নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া বিপিন

তাহার পানে চাহিয়া ক্রোধে দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিলেন।

॥ সাত ॥

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন বৈকালে বিপিন অত্যন্ত বিরক্ত-মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, এ-সব কি তুমি শুরু করলে মেজবৌ? কেষ্ট তোমার কে যে, একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন-রাত আপনা-আপনির মধ্যে লড়াই করে বেড়াচ্চ? আজ দেখলাম, দাদা পর্য্যন্ত ভারি রাগ করেছেন।

অনতিপূর্ব্বে নিজের ঘরে বসিয়া বড়বৌ স্বামীকে উপলক্ষ্য ও মেজবৌকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার-শব্দে যে সকল অপভাষার তীর ছুঁড়িয়াছিলেন, তাহার একটিও নিস্ফল হয় নাই। সব ক'টি আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে বিঁধিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি মুখে করিয়া যে পরিমাণ বিষ বহিয়া আনিয়াছিল, তাঁহার জ্বালাটাও কম জ্বলিতেছিল না। কিন্তু মাঝখানে ভাশুর বিদ্যমান থাকায় হেমাঙ্গিনী সহ্য করা ব্যতীত প্রতিকারের পথ পাইতেছিলেন না।

আগেকার দিনে যেমন যবনেরা গরু সুমুখে রাখিয়া রাজপুত-সেনার উপর বাণ বর্ষণ করিত, যুদ্ধ জয় করিত, বড়বৌ মেজবৌকে আজকাল প্রায়ই তেমনি জব্দ করিতেছিলেন।

স্বামীর কথায় হেমাঙ্গিনী দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, বল কি, তিনি পর্য্যন্ত রাগ করেচেন? এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা, শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে! এখন কি করলে রাগ থামবে বল?

বিপিন মনে মনে রাগ করিলেন, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়, তাই মনের ভাব গোপন করিয়া সহজভাবে বলিলেন, হাজার হলেও গুরুজনের সম্বন্ধে কি—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী কহিলেন, সব জানি, ছেলেমানুষটি নই যে, গুরুজনদের মান-মর্য্যাদা বুঝি নে। কিন্তু ছোঁড়াটাকে ভালবাসি বলেই যেন ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে

দিবারাত্র বিঁধতে থাকেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছু নরম শুনাইল। কারণ, হঠাৎ ভাসুরের সম্বন্ধে শ্লেষ করিয়া ফেলিয়া তিনি নিজেই মনে অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারও গায়ের জ্বালাটা নাকি বড় জ্বলিতেছিল, তাই রাগ সামলাইতে পারেন নাই।

বিপিন গোপনে ও-পক্ষে ছিলেন। কারণ, এই একটা পরের ছেলে লইয়া নিরর্থক দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি তিনি মনে মনে পছন্দ করিতেন না। স্ত্রীর এই লজ্জাটুকু লক্ষ্য করিয়া জো পাইয়া জোর দিয়া বলিলেন, বেঁধা-বিঁধি কিছুই নয়। তাঁরা নিজেদের ছেলে শাসন করচেন, কাজ শেখাচ্ছেন, তাতে তোমাকে বিঁধলে চলবে কেন? তা ছাড়া যা-ই করুন, তাঁরা গুরুজন যে।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইলেন। কারণ এই পনের-ষোল বছরের ঘরকন্নায় স্বামীর এত বড় ভ্রাতৃভক্তি তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, তাঁরা গুরুজন, আমিও মা। গুরুজন নিজের মান নিজে নিঃশেষ করে আনলে আমি কি দিয়ে ভর্ত্তি করব।

বিপিন কি একটা জবাব বোধ করি দিতে যাইতেছিলেন, থামিয়া গেলেন। দ্বারের বাহিরে কুণ্ঠিতকণ্ঠে বিনম্র ডাক শোনা গেল—

মেজদি!

স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হইল। স্বামী একটু হাসিলেন, তাহাতে প্রীতি বিকীর্ণ হইল না। স্ত্রী অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া কবাটের কাছে সরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে কেষ্টর মুখের পানে চাহিতেই সে আহ্লাদে গলিয়া গিয়া প্রথমেই যা মুখে আসিল কহিল, কেমন আছ মেজদি?

হেমাঙ্গিনী একমুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিলেন না। যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীতে এইমাত্র বিবাদ হইয়া গেল। অকস্মাৎ তাহাকে সম্মুখে পাইয়া বিবাদের সমস্ত বিরক্তিটা তাহারই মাথায় গিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী অনুচ্চ কঠোরস্বরে কহিলেন এখানে কি? কেন তুই রোজ রোজ আসিস বল্ ত?

কেষ্টর বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। এই কঠোর কণ্ঠস্বরটা সত্যই এত কঠোর শুনাইল যে, হেতু ইহার যা-ই হোক, বস্তুটা যে সস্নেহ পরিহাস নয়, বুঝিয়া লইতে এই দুর্ভাগা বালকটারও বিলম্ব হইল না।

ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় মুখখানা তাহার কালিমাখা হইয়া গেল। কহিল, দেখতে এসেচি।

বিপিন হাসিয়া বলিলেন, দেখতে এসেছে তোমাকে। এ হাসি যেন দাঁত ভ্যাংচাইয়া হেমাঙ্গিনীকে অপমান করিল। তিনি দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখের পানে একটিবার চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন, আর এখানে তুই আসিস্ নে।—যা?

আচ্ছা, বলিয়া কেষ্ট তাহার মুখের কালি হাসি দিয়া ঢাকিতে গিয়া সমস্ত মুখ আরো কালো, আরো বিশ্রী বিকৃত করিয়া অধোমুখে চলিয়া গেল।

সেই বিকৃতির কালো ছায়া হেমাঙ্গিনী নিজের মুখের উপর লইয়া গেলেন।

॥ আট ॥

দিন পাঁচ ছয় হইয়া গেল, হেমাঙ্গিনীর জ্বর ছাড়ে নাই। কাল ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, সর্দ্দি বুকে বসিয়াছে। সন্ধ্যার দীপ সবেমাত্র জ্বালা হইতেছিল, ললিত ভাল কাপড়-জামা পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, মা, দত্তদের বাড়ি পুতুল নাচ হবে, দেখতে যাব?

মা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ললিত, তোর মা যে এই পাঁচ-ছ'দিন পড়ে আছে, একবারটি কাছে এসেও ত বসিস্ নে।

ললিত লজ্জা পাইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মা সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, এই অসুখ যদি না সারে, যদি মরে যাই, কি করবি তুই। খুব কাঁদবি?

যাঃ—সেরে যাবে, বলিয়া ললিত মায়ের বুকের উপর একটা হাত রাখিল। মা ছেলের হাতখানি হাতে লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

জ্বরের উপর এই স্পর্শ তাঁহার সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া দিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটান। কিন্তু একটু পরেই ললিত উস্‌খুস্ করিতে লাগিল, পুতুল-নাচ হয়ত এতক্ষণে শুরু হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, ভিতরে ভিতরে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

ছেলের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া মা মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা যা, দেখে আয়, বেশী রাত করিস্ নে যেন।

না মা, এক্ষুনি ফিরে আসব বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা, একটা কথা বলব?

মা হাসিমুখে বলিলেন, একটা টাকা চাই ত? ঐ কুলুঙ্গিতে আছে, নিগে—দেখিস, বেশী নিস নে যেন।

না মা, টাকা চাই নে। বল তুমি শুনবে?

মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, টাকা চাই নে? তবে কি কথা রে?

ললিত আর একটু কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কেষ্টমামাকে একবার আসতে দেবে? ঘরে ঢুকবে না—ঐ দোরগোড়া থেকে একটিবার তোমাকে দেখেই চলে যাবে। কালকেও বাইরে এসে বসে ছিল, আজকেও এসে বসে আছে।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন—যা যা ললিত, এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়—আহা হা, বসে আছে, তোরা কেউ আমাকে জানাসনি রে?

ভয়ে আসতে চায় না যে, বলিয়া ললিত চলিয়া গেল। মিনিট-খানেক পরে কেষ্ট ঘরে ঢুকিয়া মাটির দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, এস দাদা, এস।

কেষ্ট তেমনিভাবে স্থির হইয়া রহিল। তিনি নিজে তখন উঠিয়া আসিয়া কেষ্টর হাত ধরিয়া বিছানায় লইয়া গেলেন। পিঠে হাত

বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, হাঁ রে কেষ্ট, বকেছিলুম বলে তোর মেজ-দিদিকে ভুলে গেছিস বুঝি ?

সহসা কেষ্ট ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ, কখনও কেহ তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই। অনেক দুঃখ-কষ্ট-যাতনা দিলেও সে ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে থাকে, লোক-জনের সুমুখে চোখের জল ফেলে না। তাহার এই স্বভাবটি হেমাঙ্গিনী জানিতেন বলিয়াই বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ছি, কান্না কিসের ? বেটাছেলেকে চোখের জল ফেলিতে আছে কি ?

প্রত্যুত্তরে কেষ্ট কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কান্না রোধ করিতে করিতে বলিল, ডাক্তার বলে যে, বুকে সর্দি বসেচে ?

হেমাঙ্গিনী হাসিলেন—এই জন্যে ? ছি ছি ! কি ছেলেমানুষ তুই রে ! বলিতে বলিতে তাঁর নিজের চোখ দিয়াও টপ্ টপ্ করিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বাঁ হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাহার মাথায় একটা হাত দিয়া কৌতুক করিয়া বলিলেন, সর্দি বসেচে—বসলেই বা রে ! যদি মরি, তুই আর ললিত কাঁধে করে গঙ্গায় দিয়ে আসবি—কেমন, পারবি নে ?

বলি মেজবৌ, কেমন আছ আজ ? বলিয়া বড়বৌ দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল কেষ্টর পানে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই যে ইনি এসে হাজির হয়েচেন। আবার ও কি ? মেজগিন্নীর কাছে কেঁদে সোহাগ করা হচ্ছে যে ! ন্যাকা আমার কত ফন্দীই জানে !

ক্লান্তিবশতঃ হেমাঙ্গিনী এইমাত্র বালিশে হেলান দিয়া কাত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তীরের মত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, দিদি, আমার দু-সাতদিন জ্বর তোমার পায়ে পড়ি, আজ তুমি যাও।

কাদম্বিনী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে বলিনি মেজবৌ। নিজের ভাইকে শাসন কচ্ছি, তুমি অমন মারমুখী হয়ে উঠচ কেন ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, শাসন ত রাত্রিদিনই চলছে—বাড়ি গিয়ে

কোরো, এখানে আমার সামনে করবার দরকার নেই, করতেও দেব না ?

কেন, তুমি কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না কি ?

হেমাঙ্গিনী হাতজোড় করিয়া বলিলেন, আমার বড় অসুখ দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, হয় চুপ কর—নয় যাও।

কাদম্বিনী বলিলেন, নিজের ভাইকে শাসন করতে পাব না ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বাড়ি গিয়ে কর গে।

সে আজ ভাল করেই হবে। আমার নামে লাগান-ভাঙান আজ বার করব—বজ্জাত মিথ্যুক কোথাকার! বললুম গরুর দড়ি নেই কেষ্টা, দু-আঁটি পাট কেটে দে—না 'দিদি তোমার পায়ে পড়ি, পুতুল-নাচ দেখে আসি—' এই বুঝি পুতুলের নাচ হচ্চে রে ? বলিয়া কাদম্বিনী গুম্‌গুম করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী কতক্ষণ কাঠের মত বসিয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, কেন তুই পুতুল-নাচ দেখতে গেলি নে কেষ্ট ? গেলে ত এইসব হ'ত না! আসতে যখন তোকে ওরা দেয় না ভাই, তখন আর আসিস্ নে আমার কাছে।

কেষ্ট আর কথাটি না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের গাঁয়ের বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি, পুজো দিলে অসুখ সেরে যায়। দাও না মেজদি!

এইমাত্র নিরর্থক ঝগড়া হইয়া যাওয়ায় হেমাঙ্গিনীর মনটা ভারী বিগড়াইয়া গিয়াছিল, ঝগড়া-ঝাঁটি ত হয়ই—সেজন্যও নয়। এমন একটা রসাল ছুতা পাইয়া এই হতভাগার দুর্দশা যে কিরূপ হইবে, আসলে সেই কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া তাঁহার বুকের ভিতরটা ক্ষোভে ও নিরুপায় আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কেষ্ট ফিরিয়া আসিতেই হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিলেন, এবং কাছে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমি ভালো হয়ে তোকে লুকিয়ে পূজো দিতে পাঠিয়ে দেব। পারবি একলা যেতে ?

কেষ্ট উৎসাহে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, একলা যেতে খুব পারব। তুমি আজকে আমাকে একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না, মেজদি—আমি কাল সকালেই পূজো দিয়ে তোমাকে প্রসাদ এনে দেব। সে খেলে তক্ষুনি অসুখ সেরে যাবে। দাও না মেজদি আজকেই পাঠিয়ে।

হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, তাহার আর সবুর সয় না। বলিলেন, কিন্তু কাল ফিরে এলে তোকে যে এরা ভারী মারবে। মার-ধোরের কথা শুনিয়া প্রথমটা কেষ্ট দমিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া কহিল, মারুক গে। তোমার অসুখ সেরে যাবে ত।

আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন, হ্যাঁ রে কেষ্ট, আমি তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর কেষ্ট কোথায় পাইবে? সে কি করিয়া বুঝাইবে, তাহার পীড়িত আর্ত্ত হৃদয় দিবারাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। একটুখানি মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার অসুখ যে সারচে না মেজদি—বুকে সর্দ্দি বসেচে যে।

হেমাঙ্গিনী এবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমার বুকে সর্দ্দি বসেছে তাতে তোর কি? তোর এত ভাবনা হয় কেন?

কেষ্ট আশ্চর্য হইয়া বলিল, ভাবনা হবে না মেজদি, বুকে সর্দ্দি বসা যে খারাপ। অসুখ যদি বেড়ে যায়, তা হলে?

তা হলে তোকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু না ডেকে পাঠালে আর আসিস্ নে ভাই।

কেন মেজদি?

হেমাঙ্গিনী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তোকে আর আমি এখানে আসতে দেব না। না ডেকে পাঠালেও যদি আসিস্ ত ভারী রাগ করব।

কেষ্ট মুখপানে চাহিনা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বল, কাল সকালে কখন ডেকে পাঠাবে?

কাল সকালেই তোর আসা চাই ?

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আচ্ছা, সকালে না হয় দুপুরবেলায় আসব—না মেজদি ? তাহার চোখে-মুখে এমনই একটা ব্যাকুল অনুনয় ফুটিয়া উঠিল যে, হেমাঙ্গিনী মনে মনে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু আর ত তাঁহার কঠিন না হইলে নয়। সবাই মিলিয়া এই নিরীহ একান্ত অসহায় বালকের উপর যে নির্য্যাতন শুরু করিয়াছে, কোন কারণেই আর ত তাহা বাড়াইয়া দেওয়া চলে না। সে হয়ত সহিতে পারে, মেজদির কাছে আসা-যাওয়া করিবার দণ্ড যত গুরুতর হোক সে হয়ত সহ্য করিতে পিছাইবে না ; কিন্তু, তাই বলিয়া তিনি কি করিয়া সহিবেন ?

হেমাঙ্গিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, তথাপি তিনি মুখ ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, বিরক্ত করিস নে কেষ্ট যা এখান থেকে। ডেকে পাঠালে আসিস, নইলে যখন-তখন এসে আমাকে বিরক্ত করিস নে।

না, বিরক্ত করিনি ত, বলিয়া ভীত লজ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া তাড়াতাড়ি কেষ্ট উঠিয়া গেল।

এইবার হেমাঙ্গিনীর দুই চোখ বাহিয়া প্রস্রবণের মত জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁহাকেই মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে। তাঁহারই আঁচলের অল্প একটুখানি মাথায় টানিয়া লইবার জন্য কাঙালের মত কি করিয়াই না বেড়াইতেছে ?

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিলেন, কেষ্ট মুখখানি অমন করে গেলি ভাই, কিন্তু তোর এই মেজদি যে তোর চেয়েও নিরুপায় ! তোকে জোর করে বুকে টেনে আনবে, সে ক্ষমতা যে তার নেই ভাই।

উমা আসিয়া কহিল, মা, কাল কেষ্টমামা তাগাদায় না গিয়ে তোমার কাছে এসে বসেছিল বলে, জ্যাঠামশাই এমন মার মারলেন যে নাক দি—

হেমাঙ্গিনী ধমকাইয়া উঠিলেন—আচ্ছা—হয়েচে—হয়েচে—যা তুই এখান থেকে। অকস্মাৎ ধমকানি খাইয়া উমা চমকাইয়া উঠিল। আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল; মা ডাকিয়া বলিলেন, শোন রে! নাক দিয়ে কি খুব রক্ত পড়েছিল।

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না খুব নয়, একটু।

আচ্ছা তুই যা।

উমা কপাটের কাছে আসিয়াই বলিয়া উঠিল, মা, এই যে কেষ্টমামা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কেষ্ট শুনিতে পাইল। বোধ করি ইহাকে অভ্যর্থনা মনে করিয়া মুখ বাড়াইয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, কেমন আছ মেজদি?

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কেন এসেছিস্ এখানে? যা, যা বলচি শীগ্‌গির। দূর হ বলচি—

কেষ্ট মূঢ়ের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল—হেমাঙ্গিনী অধিকতর তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, তবু দাঁড়িয়ে রইলি হতভাগা—গেলি নে?

কেষ্ট মুখ নামাইয়া শুধু 'যাচ্ছি' বলিয়াই চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে হেমাঙ্গিনী নির্জ্জীবের মত বিছানার একধারে শুইয়া পড়িয়া অস্ফুটে ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, একশ'বার বলি হতভাগাকে, আসিস্‌নে আমার কাছে—তবু 'মেজদি'! শিবুকে বলে দিস্ ত উমা, ওকে না আর ঢুকতে দেয়।

উমা জবাব দিল না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ডাকিয়া আনিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় বলিলেন, কোনদিন ত তোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ এই অসুখের উপর একটা ভিক্ষা চাইচি, দেবে?

বিপিন সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি চাই?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেষ্টকে আমাকে দাও—ও বেচারি বড় দুঃখী—মা-বাপ নেই—ওকে ওরা মেরে ফেলচে,—এ আর আমি চোখে

দেখতে পারচি নে।

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা হলে চোখ বুজে থাকলেই হয়।

স্বামীর এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হেমাঙ্গিনীকে শূল দিয়া বিঁধিল, অন্য কোন অবস্থায় তিনি ইহা সহিতে পারিতেন না, কিন্তু আজ নাকি, তাঁহার দুঃখে প্রাণ বাহির হইতেছিল, তাই সহ্য করিয়া লইয়া হাত-জোড় করিয়া বলিলেন, তোমার দিব্যি করে বলচি, ওকে আমি পেটের ছেলের মত ভালবেসেচি। দাও আমাকে—মানুষ করি—খাওয়াই পরাই—তার পরে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের তাই ক'রো। বড় হলে আমি একটি কথাও কবো না।

বিপিন একটুখানি নরম হইয়া বলিলেন, ও কি আমার গোলার ধান-চাল যে তোমাকে এনে দেব? পরের ভাই, পরের বাড়ি এসেচে, —তোমার মাঝখানে পড়ে এত দরদ কিসের জন্যে?

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। খানিক পরে চোখ মুছিয়া বলিলেন, তুমি ইচ্ছে করলে বট্‌ঠাকুরকে বলে, দিদিকে বলে, স্বচ্ছন্দে আনতে পার। তোমার দুটি পায়ে পড়চি, দাও তাকে।

বিপিন বলিলেন, আচ্ছা, তাই যদি হয়, আমিই বা এত বড়মানুষ কিসে যে, তাকে প্রতিপালন করব?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আগে আমার একটা তুচ্ছ কথাও ঠেলতে না এখন কি অপরাধ করেচি যে, যখন এমন করে জানাচ্ছি, বলচি সত্যিই আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে—তবু এই সামান্য কথাটা রাখতে চাইচ না? সে দুর্ভাগা বলে কি তোমরা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেলবে? আমি তাকে আমার কাছে আসতে বলব, দেখি ওঁরা কি করেন?

বিপিন এইবার রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, আমি খাওয়াতে পারব না।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আমি পারব। আমি কি বাড়ির কেউ নই যে, নিজের ছেলেকে খাওয়াতে পারব না। আমি কালই তাকে আমার কাছে এনে রাখব। দিদিরা জোর করেন ত আমি তাকে

থানার দারোগার কাছে পাঠিয়ে দেব।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিপিন ক্রোধে অভিমানে ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, সে দেখা যাবে, বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল, হেমাঙ্গিনী জানালাটা খুলিয়া দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন, সহসা পাঁচুগোপালের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে গেল। সে চেঁচাইয়া বলিতেছিল, মা, তোমার গুণধর ভাই জলে ভিজতে ভিজতে এসে হাজির হয়েচে।

খ্যাংরা কোথায় রে? যাচ্ছি আমি, বলিয়া কাদম্বিনী হুঙ্কার দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া মাথায় গামছা দিয়া দ্রুতপদে সদর-বাড়িতে ছুটিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, যা ত বাবা, ও-বাড়ির সদরে। দেখ্ তো, তোর কেষ্টমামা কোথা থেকে এল?

ললিত ছুটিয়া চলিয়া গেল, এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাঁচুদা তাকে নাড়ুগোপাল করে মাথায় দুটো থান ইঁট দিয়ে বসিয়ে রেখেচে।

হেমাঙ্গিনী শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলে, কি করেছিল সে?

ললিত বলিল, কাল দুপুরবেলা তাকে তাগাদা করতে পাঠিয়েছিল গয়লাদের কাছে তিন টাকা আদায় করে নিয়ে পালিয়েছিল, সব খরচ করে এই আসচে।

হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, কে বললে সে টাকা আদায় করেছিল?

লক্ষ্মণ গয়লা নিজে এসে বলে গেছে, বলিয়া ললিত পড়িতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই-তিন আর কোন গোলযোগ শোনা গেল না। বেলা দশটার সময় রাঁধুনি খান-কতক রুটি দিয়া গিয়াছিল, হেমাঙ্গিনী বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমনি সময় তাঁহারই ঘরের বাহিরে

কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। বড়গিন্নীর পশ্চাতে পাঁচুগোপাল কেষ্টর কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে, সঙ্গে বড়কর্তাও আছেন। মেজকর্তাকেও আনিবার জন্য দোকানে লোক পাঠান হইয়াছে।

হেমাঙ্গিনী শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেই বড়কর্তা তীব্র কটুকণ্ঠে শুরু করিয়া দিলেন, তোমার জন্যে ত আমরা বাড়িতে টিকতে পারি নে মেজ বৌমা। বিপিনকে বল, আমাদের বাড়ির দামটা ফেলে দিক, আমরা আর কোথাও উঠে যাই।

হেমাঙ্গিনী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বড়গিন্নী যুদ্ধ পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বারের ঠিক সুমুখে সরিয়া আসিয়া, হাত-মুখ নাড়িয়া বলিলেন, মেজবৌ, আমি বড়-জা, তা আমাকেও কুকুর-শিয়াল মনে কর—তা ভালই কর, কিন্তু হাজার দিন বলেচি, মিছে লোক-দেখান আহ্লাদ দিয়ে আমার ভায়ের মাথাটি খেয়ো না—এখন ঘটল ত? ওগো, দু'দিন সোহাগ করা সহজ, কিন্তু চিরকালের ভারটি ত তুমি নেবে না—সে ত আমাকেই বইতে হবে!

ইহা যে কটূক্তি এবং আক্রমণ, তাহাই শুধু হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন—আর কিছু নয়। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে?

কাদম্বিনী আরো বেশী হাত-মুখ নাড়িয়া কহিলেন, বেশ হয়েচে—খুব মৎকার হয়েচে! তোমার শেখানোর গুণে আদায়ী টাকা চুরি করতে শিখেচে—আর দু'দিন কাছে ডেকে আরো দুটো শলাপরামর্শ দাও, তা হলে সিন্দুক ভাঙতে, সিঁদ কাটতেও শিখবে।

একে হেমাঙ্গিনী পীড়িত, তাহার উপর এই কদর্য্য বিদ্রূপ ও অভিযোগে আজ তিনি জ্ঞান হারাইলেন। ইতিপূর্বে কখনও কোন কারণে ভাশুরের সুমুখে কথা কহেন নাই; কিন্তু আজ থাকিতে পারিলেন না। মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আমি কি তাকে চুরি-ডাকাতি করতে শিখিয়ে দিয়েচি দিদি?

কাদম্বিনী স্বচ্ছন্দে বলিলেন, কেমন করে জানব, কি তুমি শিখিয়ে দিয়েচ, না দিয়েচ। এ স্বভাব তার ত আগে ছিল না, এখনই বা হ'ল

কেন? এত লুকোচুরি কথাবার্তাই বা তোমাদের কি, আর এত আহ্লাদ দেওয়াই বা কি জন্যে? কতদিনের পুঞ্জীভূত আবদ্ধ বিদ্বেষ-রাশি যে এই একটু পথ পাইয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহা যিনি সব দেখেন, তিনি দেখিতে পাইলেন।

মুহূর্তকালের জন্য হেমাঙ্গিনী হতজ্ঞানের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এমন নিষ্ঠুর আঘাত, এত বড় নির্লজ্জ অপমান, মানুষ মানুষকে যে করিতে পারে, ইহা যেন তাঁহার মাথায় প্রবেশ করিল না। কিন্তু ঐ মুহূর্তকালের জন্য। পরক্ষণেই তিনি মর্মান্তিক আহত সিংহীর মত দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ভাশুরকে সুমুখে দেখিয়া মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিলেন, কিন্তু রাগ সামলাইতে পারিলেন না। বড়-জাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ কঠোরস্বরে বলিলেন, তুমি এতবড় চামার যে, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। তুমি এতবড় বেহায়া মেয়েমানুষ যে, ঐ ছোঁড়াটাকে ভাই বলেও পরিচয় দিচ্ছ। মানুষ জানোয়ার পুষলে তাকেও পেট ভরে খেতে দেয়, কিন্তু ঐ হতভাগাটাকে দিয়ে যত-রকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্যন্ত একদিন পেট ভরে খেতে দাও না। আমি না থাকলে এতদিনে ও না খেতে পেয়েই মরে যেত। ও পেটের জ্বালায় ছুটে আসে আমার কাছে, সোহাগ-আহ্লাদ করতে আসে না।

বড়-জা বলিলেন, আমরা খেতে দিই নে, শুধু খাটিয়ে নিই, আর তুমি ওকে খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেচ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন, ঠিক তাই। আজ পর্য্যন্ত কখনও ওকে দু'বেলা তোমরা খেতে দাওনি—কেবল মারধোর করেচ, আর যত পেরেচ খাটিয়ে নিয়েচ। তোমার ভয়ে হাজার দিন ওকে আসতে বারণ করেচি, কিন্তু ক্ষিদে বরদাস্ত করতে পারে না, আর আমার কাছে পেট ভরে দুটো খেতে পায় বলেই ছুটে ছুটে আসে—চুরি-ডাকাতির পরামর্শ নিতে আসে না। কিন্তু তোমরা এতবড় হিংসুক যে, তাও চোখে দেখতে পার না।

এবার ভাসুর জবাব দিলেন। কেষ্টকে সুমুখে টানিয়া আনিয়া তাহার কোঁচার খুঁট খুলিয়া একটা কলাপাতার ঠোঙা বাহির করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, হিংসুক আমরা! কেন যে ওকে ভাল চোখে দেখতে পারি নে, তা তুমি নিজের চোখে ছাখো। মেজবৌমা, তোমার শেখানোর গুণেই ও আমার টাকা চুরি ক'রে তোমার ভালোর জন্যে কোন্ একটা ঠাকুরের পূজা দিয়ে প্রসাদ এনেচে—এই নাও; বলিয়া তিনি গোটা-দুই সন্দেশ ও ফুল-পাতা ঠোঙার ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন।

কাদম্বিনী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, মা গো! কি মিটমিটে শয়তান, কি ধড়িবাজ ছেলে! বেশ ত মেজবৌ, এখন তুমিই বল না, কি মতলবে ও চুরি করেচে? ও কি আমার ভালোর জন্যে?

হেমাঙ্গিনী ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন। একে তাঁহার অসুস্থ শরীর, তাহাতে এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ, তিনি দ্রুতপদে কেষ্টর সম্মুখীন হইয়া তাহার দুই গালে সশব্দে চড় কষাইয়া দিয়া কহিলেন, বদমাইস চোর, আমি তোকে চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েছি? কতদিন তোকে আমার বাড়ি ঢুকতে বারণ করেচি, কতবার তোকে তাড়িয়ে দিয়েচি! আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, তুই চুরির মতলবেই যখন-তখন উঁকি মেরে দেখতিস্।

ইতিপূর্ব্বেই বাড়ির সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। শিবু কহিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি মা, পরশু রাত্তিরে ও তোমার ঘরের সুমুখে আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। আমি এসে না পড়লে নিশ্চয় তোমার ঘরে ঢুকে চুরি করত।

পাঁচুগোপাল বলিল, জানে মেজখুড়ীমার অসুখ শরীর—সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়েন—ও কি কম চালাক!

মেজবৌয়ের কেষ্টর প্রতি আজকাল ব্যবহারে কাদম্বিনী যেরূপ প্রসন্ন হইলেন, এই ষোল বৎসরের মধ্যে কখনও এরূপ হন নাই। অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিলেন, ভিজে বেড়াল! কেমন করে জানব মেজবৌ, তুমি ওকে বাড়ি ঢুকতেও বারণ করেচ। ও বলে বেড়ায়,

মেজদি আমাকে মায়ের চেয়ে ভালবাসে। ঠোঙাসুদ্ধ নির্মাল্য টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, টাকা তিনটে চুরি করে কোথা থেকে দুটো ফুলটুল কুড়িয়ে এনেচে।

বাড়ি লইয়া গিয়া বড়কর্তা চোরের শাস্তি শুরু করিলেন। সে কি নির্দ্দয় প্রহার! কেষ্ট কথাও কহে না, কাঁদেও না। এদিকে মারিলে ওদিকে মুখ ফিরায়, ওদিকে মারিলে এদিকে মুখ ফিরায়। ভারি গাড়িসুদ্ধ গরু কাদায় পড়িয়া যেমন করিয়া মার খায়, তেমনি করিয়া কেষ্ট নিঃশব্দে মার খাইল। এমন কি কাদম্বিনী পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন,হাঁ, মার খাইতে শিখিয়াছিল বটে! কিন্তু ভগবান জানেন, এখানে আসার পূর্বে নিরীহ স্বভাবের গুণে কখন কেহ তাহার গায়ে হাত তুলে নাই।

হেমাঙ্গিনী নিজে ঘরের ভিতর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়াছিলেন। উমা মার দেখিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জ্যাঠাইমা বললেন, কেষ্টমামা বড় হলে ডাকাত হবে! ওদের গাঁয়ে কি ঠাকুর আছে—

উমা—?

মায়ের অশ্রুবিকৃত ভগ্ন ভঠস্বরে উমা চমকাইয়া উঠিল। কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

হাঁ রে, এখানে কি তাকে সবাই মিলে মারচে? বলিয়াই তিনি মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

মায়ের কান্না দেখিয়া উমাও কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর কাছে বসিয়া, নিজের আঁচল দিয়া জননীর চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, পেসন্নর মা কেষ্টমামাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে।

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিলেন না, সেইখানে তেমনি করিয়াই পড়িয়া রহিলেন। বেলা দু-তিনটার সময় সহসা কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল। আজ অনেকদিনের পর পথ্য করিতে বসিয়াছিলেন —সে খাবার তখনোও একধারে পড়িয়া শুকাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর বিপিন ও-বাড়িতে বৌঠানের মুখে সমস্ত ব্যাপার

অবগত হইয়া ক্রোধভরে স্ত্রীর ঘরে ঢুকিতেছিলেন, উমা কাছে আসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, মা জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

বিপিন চমকাইয়া উঠিলেন, সে কি রে আজ তিন-চারদিন জ্বর ছিল না ত!

বিপিন মনে মনে স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কত যে বাসিতেন তাহা বছর চার-পাঁচ পূর্বে দাদাদের সহিত পৃথক হইবার সময় জানা গিয়াছিল। ব্যকুল হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, তখনও তিনি মাটিব উপর পড়িয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া শয্যায় তুলিবার জন্ত গায়ে হাত দিতেই হেমাঙ্গিনী চোখ মেলিয়া, একমুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—কেষ্টকে আশ্রয় দাও, নইলে এ জ্বর আমার সারবে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতেই মাপ করবেন না।

বিপিন পা ছাড়াইয়া লইয়া, কাছে বসিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দেবে?

বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন, তুমি যা চাও তাই হবে, তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

হেমাঙ্গিনী আর কিছু বলিলেন না, বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন।

জ্বর রাত্রেই ছাড়িয়া গেল, পরদিন সকালে উঠিয়া বিপিন ইহা লক্ষ্য করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হাত-মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া দোকানে বাহির হইতে ছিলেন, হেমাঙ্গিনী আসিয়া বলিলেন, মার খেয়ে কেষ্টর ভারী জ্বর হয়েছে, তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসচি।

বিপিন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তাকে এ-বাড়িতে আনবার দরকার কি? যেখানে আছে সেখানেই থাক না।

হেমাঙ্গিনী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিলেন, কাল রাত্রে যে তুমি কথা দিলে আশ্রয় দেবে?

বিপিন অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ—সে কে যে, তাকে ঘরে এনে পুষতে হবে! তুমিও যেমন?

কাল রাত্রে স্ত্রীকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, আজ সকালে তাহাকে সুস্থ দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া দিলেন। ছাতাটা বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, পাগলামি ক'র না, —দাদারা ভারী চটে যাবেন।

হেমাঙ্গিনী শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, দাদারা চটে গিয়ে কি তাকে খুন করে ফেলতে পারেন, না, আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আটকে রাখতে পাবে? আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হয়েছে। আমি কেষ্টর মা?

আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া বিপিন চলিয়া যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এ-বাড়িতে তাকে আনতে দেবে না?

সর, সর—কি পাগলামি কর? বলিয়া বিপিন চোখ রাঙাইয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, শিবু, একটা গরুর গাড়ি আন, আমি বাপের বাড়ি যাব।

বিপিন শুনিতে পাইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, ইস! ভয় দেখানো হচ্ছে! তারপর দোকানে চলিয়া গেলেন।

কেষ্ট চণ্ডীমণ্ডপের একধারে ছেঁড়া মাদুরের উপর জ্বরে, গায়ের ব্যথায় এবং বোধ করি বুকের ব্যথায় আচ্ছন্নের মত পড়িয়া ছিল। হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, কেষ্ট!

কেষ্ট যেন প্রস্তুত হইয়া ছিল—এইবারে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, মেজদি! পরক্ষণে সলজ্জ হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। যেন তাহার কোন অসুখ-বিসুখ নাই, এইভাবে মহা-উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচা দিয়া ছেঁড়া মাদুর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, ব'স।

হেমাঙ্গিনী তাহার হাত ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, আর ত বসব না দাদা, আয় আমার সঙ্গে। আমাকে বাপের বাড়ি আজ তোকে পৌঁছে দিতে হবে যে।

চল, বলিয়া কেষ্ট তাহার ভাঙা ছড়িটা বগলে চাপিয়া লইল এবং ছেঁড়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিল।

নিজেদের বাড়ির সদরে গো-যান দাঁড়াইয়াছিল, হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন। গাড়ি যখন গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন পশ্চাতে ডাকাডাকি চিৎকার গারোয়ান গাড়ি থামাইল। ঘর্মাক্ত কলেবরে আরক্ত-মুখে বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাও মেজবৌ!

হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে দেখাইয়া বলিলেন, এদের গ্রামে।

কখন ফিরবে?

হেমাঙ্গিনী গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ভগবান যখন ফেরাবেন, তখনই ফিরব।

তার মানে?

হেমাঙ্গিনী পুনরায় কেষ্টকে দেখাইয়া বলিলেন, কখনও যদি কোথাও এর আশ্রয় জোটে, তবেই একা ফিরে আসতে পারব, না হয়, একে নিয়েই থাকতে হবে।

বিপিনের মনে পড়িল, সেদিনেও স্ত্রীর এমনি মুখের ভাব দেখিয়াছিলেন এবং এমনই কণ্ঠস্বরই শুনিয়াছিলেন, যেদিন মতি কামারের নিঃসহায় ভাগিনেয়ের বাগানখানি বাঁচাইবার জন্য তিনি একাকী সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। মনে পড়িল, এ মেজবৌ সে নয়, যাহাকে চোখ রাঙাইয়া টলান যায়!

বিপিন নম্রস্বরে বলিলেন, মাপ কর মেজবৌ, বাড়ি চল।

হেমাঙ্গিনী হাতজোর করিয়া কহিলেন, আমাকে তুমি মাপ কর—কাজ না সেরে আমি কোনমতেই বাড়ি ফিরতে পারব না।

বিপিন আব এক মুহূর্ত স্ত্রীর শান্ত দৃঢ় মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেষ্টর ডান-হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কেষ্ট, তোর মেজদিকে তুই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই; শপথ করছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না। আয় ভাই, তোর মেজদিকে নিয়ে আয়।

———

অাঁধারে আলো

॥ এক ॥

সে অনেক দিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে; বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—বাবা, কথা শোন, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনোমতেই পারব না। তাহলে পাস হতে পারব না।

কেন পারবি নে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায়, পাস হতে তোর কি বাধা হবে, আমি ত ভেবে পাই নে, সতু!

না মা, সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাস্ নে দাঁড়া,আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েছি বাবা, আমার মান রাখবি নে?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা করে কথা দিলে কেন?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন; বলিলেন, সে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু তোকে ত মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া, বিধবার মেয়ে, বড় দুঃখী—কথা শোন্ সত্য, রাজী হ।

আচ্ছা, পরে বলব, বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত আট বৎসর হইল স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে জমিদারী শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না! জননী মনে

মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাস করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্র-পুত্রবধূর হাতে জমিদারী এবং সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া, তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাটীতে এতদিন পর্যন্ত কোন কাজকর্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত উপলক্ষ্যে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহার মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী, তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী তাহাও তিনি দুই-চারিটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, আগে ত মেয়ে দেখাই, তার পর কেমন না পছন্দ হয়, দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গার ঠিক সুমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকুরুণটিকে কে হীরামুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে ব'স্।

সত্যর চমক ভাঙ্গিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও!

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছিস নে—ঐ একফোঁটা মেয়ের সামনে তোর লজ্জা কি!

আমি কারুকে লজ্জা করি নে, বলিয়া সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং

পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিছুতেই বসতে পারব না—আমার ভারি মাথা ধরেছে। বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক চেঁচামেচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আজ এসব তাহার ভাল লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল. ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে?

শুতে নয়, পড়তে যাচ্ছি। এম. এ'র পড়া সোজা নয় ত! সময় নষ্ট করলে চলবে কেন? বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুম্‌দুম্‌ শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া, উপরের দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙিয়া গেল। সে কান খাড়া করিয়া শুনিল—ঝুম্‌। আর এক মুহূর্ত—ঝুম্‌ঝুম্‌। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনা-পরা লক্ষ্মীঠাকুরুণটির মত মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞাসা করলেন।

সত্য মুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তোমার নাম কি?

আমার নাম রাধারাণী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

॥ দুই ॥

একফোঁটা রাধারাণীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম. এ. পাস করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি না হওয়া পর্যন্ত ত কোনমতেই না, খুব সম্ভব, পরেও না। সে বিবাহ করিবে না, কারণ সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন কি একরকম করিয়া ওঠে, কোথাও কোন নারীমূর্তি দেখিলেই আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া দিয়া, একাকী বিরাজ করে; সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মী-প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন, অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়েসের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন-কোন মতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ হয়তো অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠে; সে তৎক্ষণাৎ যে কোন একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোর-বাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূরে নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত, তাহারই উদ্দেশে আসিতে গিয়া একস্থানে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশী নয়। পরণে সাদাসিদে কালাপেড়ে শাড়ি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কার-বর্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত

পাণ্ডা একমনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে :

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যের কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদমুখের খাতির ত্যাগ করিয়া হাতের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া 'বড়বাবু'র শুষ্ক বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দু'জনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটা হইল না। কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া যখন সে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য উপরে উঠিল, তখন রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া আলনা হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল, তখন পূর্বদিনের মত আজিও তিনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আজিও চারি চক্ষু মিলিল, আজিও তাহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুত বহিয়া গেল ; সে কোনমতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

॥ তিন ॥

রমণী প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু পূর্বে সত্য কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবীতটে উপর্য্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোন, তিনি যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন, এবং সে-বিদ্যায় পারদর্শী সত্যর অন্তর্য্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনের ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম বক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিতলের কলস, দক্ষিণ হস্তে সিক্তবস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। সত্য এদিক-ওদিক চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তিনি উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন ত বড়ো ভাল হয়।

অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যের মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতে পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া রমণী আবার কথা কহিলেন, ঝির অসুখ, সে আসতে পারলে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাকতে পারি নে,—আপনারও দেখচি এ বদ্ অভ্যাস আছে।

সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন?

চোরবাগানে আমার বাসা।

আমাদের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটায় মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।

তাই হবে।

বহুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাছেই আমাদের বাড়ি—এবারে যেতে পারব—নমস্কার।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড় গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনিই বুঝিবেন, সেদিন কি হইয়াছিল। সবাই বুঝিবেন না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস—সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন, চুম্বক-শলাকার মত শুধু এই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্য অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল; সে নিশ্চিত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, হারামজাদা, এত বেলা হয়েচে, তুলে দিতে পারিস্‌নি? যা তোর এক টাকা জরিমানা।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই রুষ্ট-মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম করিয়া, রাস্তার দু-দিকে প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল। কিন্তু গঙ্গায় আসিয়া ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইল।

গাড়ি হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত বলিলেন, এত দেরি যে? আমি আদ্‌ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শিগ্‌গির নেয়ে নিন, আজও আমার ঝি আসেননি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল। সাঁতার কাটা তাহার কোথায় গেল! সে কোনমতে গোটা দুই-তিন

ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমার গাড়ি গেল কোথায় ?

রমণী কহিলেন, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করেচি।

আপনি ভাড়া দিলেন !

দিলামই বা। চলুন। বলিয়া আর একবার ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিরীহ, যত অনভিজ্ঞই হৌক, একবার সন্দেহ হইত—এ সব কি !

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন, চোরবাগান ?

সত্য কহিল, হ্যাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে ?

সত্য আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন ?

আপনি ত চোরের রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নির্বাক মরাল-গমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল্ ছলাৎ-ছল শব্দে—অর্থাৎ ওরে মূঢ়—ওরে অন্ধ যুবক ! সাবধান ! এ-সব ছলনা—সব ফাঁকি, বলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ, একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, গাড়ি-ভাড়াটা—

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত আপনার দেওয়াই হয়েচে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি করে ?

আমার আর আছে কি দেব ! যা ছিল সমস্তই তুমি ত চুরি-ডাকাতি করে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়ীৎরেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া

কের অন্তস্থল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্ত্তে সাধ হইল, এই প্রকাণ্ড রাজপথেই ওই দুই রাঙা পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কন্তু চক্ষের নিমিষে গভীর লজ্জায় তাহার মাথা এমনি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও-ফুটপাতে তাঁহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? বলি, কিছু আছে টাছে? দু'পয়সা টানতে পারবে ত?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানি নে, কিন্তু হাবা-গোবা লোক-গুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি! কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখতে যেন রাজপুত্তুর! যেমন চোখ-মুখ, তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিকে দিব্যি মানায়—দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিল, যেন একটি জোড়া-গোলাপ ফুটে ছিল।

রমণী মুখ টিপিয়া বলিল, আচ্ছা চল্! পছন্দ হয়ে থাকে ত না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারবে না, তা বলে দিলুম।

।। চার ।।

জ্ঞানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ, অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই অপরাধেই শ্রীমন্ত বেচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক, ইহা অতি সত্য কথা, সত্য নাকটি সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্ জুয়ানের বাংলা তর্জ্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ উদ্দেশ্যের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা সহরের পথে-ঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে

বানের স্রোতে গা ভাসাইতে চলা নিরাপদ কি না।

দিন-দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়—না?

সত্য সরলার প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল; আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, কি ভয়ানক কষ্ট! আচ্ছা সরলাই বা তার স্বামীকে এত ভালবাসলে কি করে, আর তার বড় জা-ই বা পারেনি কেন বলতে পার?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই! বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাসতে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্য্যন্ত ভালবাসা কি, জানতেও পায় না জানবার ক্ষমতা তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গান-বাজনা হাজার ভাল হলেও মন দিয়ে শুনতে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগতেই পারে না! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে করতে ইচ্ছা করে।

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন?

রমণী উদ্দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর করিল, তারা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশী। এই যেমন সরলার ভাশুর, স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হ'ল না।

সত্য চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি শয়তান মেয়েমানুষ! আমি থাকতুম ত রাক্ষসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্যে কহিল, থাকতে কি করে? প্রমদা বলে সত্যই কেউ ছিল না—কবির কল্পনা—

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন? আর সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভেতরই ভগবান আছেন, আত্মা আছে

কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বলচি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভাল বাসবে, তা-না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয় না যে সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড় ?

রমণী কহিল, ইংরাজী জানি নে ত, বাংলা বই যা বেরোয় সব পড়ি। এক-একদিন সারারাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল আমাদের বাড়ি, যত বই আছে সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি ?

হাঁ, আমাদের বাড়ি—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, ছি ছি,—

ছি ছি কিছু নেই—চল !

না না, আজ না—আজ থাক্, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে আজ তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

॥ পাঁচ ॥

সকালবেলা স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চারদিন গত হইয়াছে সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই—আর তিনি গঙ্গাস্নানে আসেন না।

আকাশ-পাতাল কত কি যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই, হয়ত বা মৃত্যুশয্যায় ! কে জানে !

সে গলিটা জানে বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ি

কোথায় বাড়ি, কিছুই জানে না। মনে করিলে অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই, কেন সেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল ?

সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ।

বাবু।

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েচে তাঁর ? বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সামলাইতে পারিল না।

দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ হয় হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়া বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ, আপনাকে দেখতে চাইচেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েচে কি ?

দাসী কহিল, না, তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল খুব বড় বাড়ি, দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান ঝিমাইতেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত ? তিনি ত আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল, দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি

তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, মনে হইল সেগুলি চমৎকার সাজান। কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল। দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ ঘর—চলুন। দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া সু-উচ্চকণ্ঠে বলিল, দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর।

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল, তাহাতে সত্যের সমস্ত মস্তিষ্ক ওলট-পালট হইয়া গেল; তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোনমতে দোর ধরিয়া সে সেইখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মোঝেয় মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু-তিনজন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়াম, একজন বাঁয়া-তবলা লইয়া বসিয়া আছে,—আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি, এই মাত্র নৃত্য করিতেছিলেন, দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা, নানা অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ-দুটি ঢুল-ঢুল করিতেছে; ত্বরিতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া, সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মিরগি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই, ইয়ারকি করিস নে, ওঠ্—ও সবে আমার ভারী ভর করে।

প্রবল তড়িৎস্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, উহার করস্পর্শে সত্যর আপাদমস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, আমার নাম শ্রীমতি বিজ্‌লী—তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু—

সমস্ত লোকগুলি হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর গড়াইয়া শুইয়া পড়িল, —কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজ্‌লী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম, বাড়াবাড়ি করিস্ নে—আসুন, উঠে আসুন, বলিয়া জোর

করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোর করিয়া শুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা
জীবন যৌবন হাম. সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকুল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।।
অব সো ন যবহু মরি পরিহোয়ত—
তবহুঁ মানব নিজা দেহা—

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই, বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু—

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছামিছি সঙ্ সাজাচ্চ ?

বিজ্‌লী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ, মিছামিছি কিসে ? ও সত্যকারের সঙ বলেই ত এমন আমোদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের তামাসা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস গাবু, সত্য বল্ ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি ? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই, মোচলমান খ্রীষ্টানও নই। হিঁদুর ঘরের এতবড় ধাড়ী মেয়ে, হয়

সধবা, নয় বিধবা—কি মতলবে চুটিয়ে পীরিত কর্‌ছিলি বল্‌ ত? বিয়ে করবি বলে, না ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে?

ভারি একটা হাসি উঠিল। তার পর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল।

সত্য একটিবার মুখও তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই বা কে? থাক্‌ সে।

বিজ্‌লী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, বেশ ত আমি! যা ক্ষ্যামা, শিগ্‌গির যা—বাবুর খাবার নিয়ে আয়, স্নান করে এসেচেন—বাঃ, আমি কেবল তামাসাই কচ্চি যে! বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্বের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বহ্নিতপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থ-ই জুড়াইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজ্‌লী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন? জাত যাবে? আমি হাড়ি না মুচি?

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, তা হলে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজ্‌লী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবুও ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখচি! বলিয়া আবার হাসিল, কিন্তু তাহা শব্দমাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য, হাবু নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখন শিখিনি, কিন্তু নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেচি।

বিজ্‌লী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোঁয়া খাবে না?

না।

বিজ্‌লী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রত মিশিল ; জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বলছি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দু'দিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েচে, কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে আজ নয়, দু'দিন পরে নয়, এ-জন্মে নয়, আগামী জন্মে নয়—কোন কালে আপনার ছোঁয়া খাব না। 'অনুমতি করুন, আমি যাই—আপনার নিশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এমনি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল বিজ্‌লীবিবি, অরসিকেষু রহস্য নিবেদনম্‌। যেতে দাও—যেতে দাও —সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিলে।

বিজ্‌লী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থই তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল। সে যে কল্পনাও করে নাই, এমনি মুখচোরা শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজ্‌লী মৃদুস্বরে কহিল আর একটু বসো।

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, উঁ হুঁ হুঁ, প্রথম চোটে একটু জোর খেলবে—যেতে দাও—যেতে দাও—সুতো ছাড়ো—সুতো ছাড়ো—

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল ; বিজ্‌লী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই—নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় অপরাধ হয়েচে—

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিল।

সে পুনর্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমার পড়ার ঘর একবার দেখবে না ? একটিবার এসো, মাপ চাচ্ছি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজ্‌লী পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, কাল দেখা হবে ?

না।

আর কি কখনো দেখা হবে না ?

না।

কান্নায় বিজ্‌লীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, ঢোঁক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কি তাও যদি না হয়, বল, এই কথাটা আমার বিশ্বাস করবে।

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনের-ষোল দিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছে ত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজ্‌লীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে কি করিবে ? হায় হায়! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!

সত্য প্রশ্ন করিল, কি বিশ্বাস করব ?

বিজ্‌লীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই! বিজ্‌লী মুখ না তুলিয়াও বুঝিল সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতেই পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাঁজরাগুলো ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে।

সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসার একটা কথা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে! সে যে দাগী আসামী! অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্বাঙ্গে মাখিয়া বিচারের সুমুখে দাঁড়াইয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দোষ! যতই বিলম্ব হইতে

লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে ; কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে ?

সভ্য অধির হইয়া উঠিয়াছে ; সে বলিল, চললুম।

বিজ্‌লী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না ; কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও, কিন্তু যে-কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে-কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস করো, সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না। একটু থামিয়া কহিল, সব মন্দিরে দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীবে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না। বিজ্‌লী নর্ত্তকী, তথাপি সে যে নারী ! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা নারীদেহ ! ঘণ্টা খানেক পরে সে যখন এ-ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্দ্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা ঐ মাতালটা পর্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল—কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে। মাইরি, ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখ দিলে না। দাও দাও, থালাটা এগিয়ে দাও ত, হ্যাঁ বলিয়া নিজেই টানিয়া লইয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটি কথাও বিজ্‌লীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু'পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলো খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুললে যে ?

বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পরব না বলে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ আর না। বাইজী মরেছে—

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী ?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্য্যি উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্যে মরে গেল বন্ধু।

॥ ছয় ॥

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়িতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন। খাওয়ানো-দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গানের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন-চারটি নর্তকী—ইহারাই নাচ-গান করিবে। দ্বিতলে বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারাণী একাকী নীচের জন-সমাগম দেখিতেছিল ? নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, এত মন দিয়ে কি দেখচ বল ত ?

রাধারাণী স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আসচে—বাইজীদের সাজ-সজ্জা—কিন্তু হঠাৎ তুমি যে এখানে ?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, একলাটি বসে আছ, তাই একটু গল্প করতে এলুম।

ইস্ !

সত্যি ! আচ্ছা, দেখচ ত, বল দেখি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে

তোমার পছন্দ হয় ?

ঐটিকে, বলিয়া রাধারাণী আঙুল তুলিয়া যে স্ত্রীলোকটি সকলের পিছনে নিতান্ত সাদাসিধা পোশাকে বসিয়াছিল তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, ও যে নেহাত রোগা।

তা হোক, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু বেচারী গরীব—গায়ে গয়না-টয়না এদের মত নেই।

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা হবে। কিন্তু, এদের মজুরী কত জান ?

না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এদের দু'জনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরীব বলচ, তার দু'শ টাকা।

রাধারাণী চমকিয়া উঠিল—দু'শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে ?

কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে, চার-পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত,—কিন্তু এখন পারবে কিনা বলা যায় না।

তবে অত টাকা দিয়ে আনলে কেন ?

তার কমও আসে না। এতেও আসতে রাজী ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েচে।

রাধারাণী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন ?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক, এত টাকা সহজে কেহই দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয় না, এই ওর ফন্দি! দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।

কথাটা রাধারাণী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, তোমার গরজ ছাই! কিন্তু, ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন ?

শুনবে ?

হ্যাঁ বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, ওর নাম বিজ্‌লী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রাণী, ঘরে যাবে?

যাব, চল, বলিয়া রাধারাণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারাণী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আজ ওকে অপমান করে শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে?

এদিকে সত্যেন্দ্রর নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। কেউ জানবেও না।

রাধারাণী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে এবং উপরের বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠের সলজ্জ চীৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজ্‌লী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে - পা এমন করিয়া দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা-দুই পূর্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

'আপনাকে ডাকছেন।' বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া দেখিল, পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার-তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা আপনাকে ডাকচেন।

বিজ্‌লী বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে

ডাকচেন ?

মা ডাকচেন।

তুমি কে ?

আমি বাড়ির চাকর।

বিজ্‌লী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করে এসো।

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজ্‌লী ত ? আপনাকেই ডাকচেন,—আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল, বলিয়া বিজ্‌লী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারাণী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত-পদে বিজ্‌লী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র সে সম্ভ্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল ; একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিনতে পার ?

বিজ্‌লী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাধারাণী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোট বোনকে না হয় না চিনলে দিদি, সে দুঃখ করি নে ; কিন্তু এটাকে না চিনতে পারলে সত্যিই ভারী ঝগড়া করব। বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজ্‌লী তথাপি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আঁধার আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যবিকশিত গোলাপ-সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাধারাণী নিস্তব্ধ। বিজ্‌লী নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধারাণী কহিল, চিনেচ দিদি ?

চিনেছি বোন।

রাধারাণী কহিল, দিদি, সমুদ্র-মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোট বোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।

সত্যেন্দ্রর একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া বিজ্‌লী একদৃষ্টে দেখিতেছিল ; মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিষের বিষই যে অমৃত বোন। আমি বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।

রাধারাণী সে-কথার উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা করবে দিদি ?

বিজ্‌লী একমুহূর্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অস্পৃশ্যটাকে চিনতে পেরে, বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সেদিন দর্প করে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু, সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিলেন। তিনি ভেঙ্গে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে-কথা আমার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না বোন। বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, প্রাণের ভগবানকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সব-দিকে মাটি হয়ে যেতুম ? তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম।

কান্নায় রাধারাণীর গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না! বিজ্‌লী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম, কখনো দেখা হলে তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখব। কিন্তু আর তার দরকার নেই। এই ছবিটুকু দাও দিদি—এর বেশী আমি চাই নে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না—আমি চললুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারাণী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে দেখা হবে দিদি ?

দেখা আর হবে না বোন। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইটে বিক্রী করে যত শ্রীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন ? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাকতে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল ?

লজ্জায় রাধারাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিজ্‌লী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝেছি। আমাকে অপমান করবেন বলে, না ? তা ছাড়া ত এত চেষ্টা করে আমাকে আনবার কোন কারণই দেখি নে।

রাধারাণীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজ্‌লী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন ? তবে তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পায়ে আমার শত-কোটী প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছুই নেই। অপমান করলে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি !

নমস্কার বোন ! বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই—আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। চললুম।

সমাপ্ত